অধ্যায় - ০৩

মঙ্গলকাব্যের সাধারণ আলোচনা

'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' গ্রন্থের প্রথমেই আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন-

> ''খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ভারতচন্দ্রের কাল পর্যন্ত বঙ্গ সাহিত্যে যে বিশেষ একশ্রেণীর ধর্মবিষয়ক আখ্যান-কাব্য প্রচলিত ছিল, তাহাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত।''[১]

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য মঙ্গলকাব্য সম্পর্কে জানিয়েছেন-

> ''দেবদেবীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক অনেক ছড়া ও ব্রতকথা পাঁচ ছয় শতাব্দী পূর্ব হইতেই লোকের মুখে মুখে গীত হইয়া আসিতেছে। এইগুলিরই অপেক্ষাকৃত সুগঠিত রূপকে পাঁচালী বলা হয়। ক্ষমতাবান কবিদের হাতে পড়িয়া এই পাঁচালীই মঙ্গলকাব্যে পরিণতি লাভ করিয়াছে।''[২]

আবার আশুতোষ ভট্টাচার্য জানালেন-

> ''মধ্যযুগের বাংলার সমাজ এই নূতন ও পুরাতনের মধ্যে সুন্দর সামঞ্জস্য বিধান করিয়া পরস্পর বিপরীতমুখী দুইটি সংস্কারকে একসূত্রে গাঁথিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে। বাংলার জলবায়ুতে দেশীয় লৌকিক সংস্কারের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য সংস্কার যে কিভাবে একদেহে লীন হইয়া আছে মঙ্গলকাব্যগুলি তাহারই পরিচয়।''[৩] মঙ্গলকাব্যের শ্রেণী-রূপের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বললেন- ''বাংলার লৌকিক দেবতাদিগকে অবলম্বন করিয়া যে সকল কাব্যের মধ্যে বাংলার জীবনাশ্রিত নরনারী চরিত্রেরই জয়গান করা হইয়াছে, তাহাদিগকেই বাংলার মঙ্গলকাব্য বলা হইয়া থাকে।''[৪]

মঙ্গলকাব্যের মঙ্গল শব্দটি নানার্থে যুক্ত। 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' গ্রন্থে আশুতোষ ভট্টাচার্য চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতটি উল্লেখ করে বলেছেন-

> ''মঙ্গল কাব্যগুলি গান করিয়া দেবতার মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচার করা হইত। সেই গান একটি বিশেষ রকম সুরে হইত এবং সেই সুরকেও মঙ্গল বলিত। বাংলা যাত্রা মানে যেমন গান ও গমন উভয়ই, হিন্দীতে তেমনি মঙ্গল মানে মেলা যাত্রা বা গমন; কাশীতে বুঢ়োমঙ্গল নামে এক প্রসিদ্ধ মেলা হয়, তাহা কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের বুড়ামঙ্গল কবিতায় বাঙালীর কাছেও পরিচিত হইয়াছে। যে গান শুনিলে মঙ্গল হয়, যে গানে মঙ্গলকারী দেবতার মাহাত্ম্য

প্রচারিত, যে গান মেলায় গীত এবং যে গান একদিন যাত্রা করিয়া অর্থাৎ আরম্ভ হইয়া আট দিন ব্যাপিয়া চলে তাহাকেই মঙ্গল গান বলে।''[৫]

মঙ্গলকাব্যের 'মঙ্গল' নামের ব্যাখ্যায় গোপাল হালদার জানিয়েছেন-

''মঙ্গল-কাব্যের 'মঙ্গল' নাম কেন হল, এ সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলবার উপায় নেই। কেউ মনে করেন, 'মঙ্গল রাগে' প্রথমে তা গাওয়া হত। 'মঙ্গল-গীতি' শব্দটা জয়দেবেও আছে, কিন্তু মঙ্গল রাগের সম্বন্ধে নিশ্চিত করে কিছু জানা যায় না। কেহ অনুমান করেন, বিবাহাদি অনুষ্ঠানে যেসব গান গাওয়া হত, তাহারই সাধারণ নাম ছিল 'মঙ্গল'। এখনো মালয়ালাম ভাষায় বিবাহ অর্থেই এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আর, 'মঙ্গল' শব্দটি আর্যভাষার নয়, এ হল অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অভিমত। মঙ্গল নামক দৈত্যকে চন্ডী বধ করেন, তাই চন্ডীমঙ্গল কথার উৎপত্তি,- এ কথা সম্ভবত পরবর্তী উদ্ভাবনা। এক মঙ্গলবার থেকে আর-এক মঙ্গলবার এই আট দিন ধরে গাওয়া হয় বলে 'অষ্টমঙ্গলা' নাম, এটিও হয়তো আর একটি উদ্ভাবনা। অন্য দিকে, 'জাগরণ' নামে একটি কথাও আছে; চন্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল ও ধর্মমঙ্গলের পালাসমূহের মধ্যে এক একটি অংশ আছে যার নাম 'জাগরণ'। সাধারণ ভাবে অনুমান করা চলে যে, সে অংশটি রাত্রি জেগে গাওয়া হত। হয়তো সেই পালাটিরই গুরুত্ব ছিল সমধিক; তাই সমগ্র ভাবেও মঙ্গলকাব্যকে কখনো কখনো 'জাগরণ' বলা হয়।''[৬]

মঙ্গলকাব্যের দুটি ধারা-

১) লৌকিক ধারা (বাঙলার বিষয়বস্তু)- এটি-ই প্রথম ও প্রধান। এমন কি গোপাল হালদার মনে করেন- ''মঙ্গল' কথাটাও হয়তো মূলত অন্-আর্য ভাষা থেকে আগত। মনসামঙ্গল, চন্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, শিবায়ন বা শিবমঙ্গল, কালিকামঙ্গল, শীতলামঙ্গল, রায়মঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, সারদামঙ্গল, এসব হল তার নানা শাখা- সেই Matter of Bengal নিয়ে যা গঠিত।''[৭]

২) পৌরাণিক ধারা (সংস্কৃতের বিষয়বস্তু)- এই ধারা প্রথম ধারা থেকে অপেক্ষাকৃত অনেক পরের। পরবর্তী কালে যখন সংস্কৃত চর্চা ও সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের দানাবাঁধে তখন এর বিস্তার ক্রমান্বয়ে বেড়ে ওঠে। তাই গোপাল হালদার মনে করিয়ে দেন- ''পৌরাণিক ধারা হল পৌরাণিক দেবদেবীর মাহাত্ম্যের আখ্যান, অর্থাৎ সেই Matter of Sanskrit World যার অবলম্বন। এ ধারার শাখা হল দূর্গামঙ্গল, ভবনীমঙ্গল, সূর্যমঙ্গল, গৌরীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, কমলামঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, চন্ডিকামঙ্গল প্রভৃতি।''[৮]

এছাড়া বৈষ্ণবেরাও তাঁদের কতকগুলি সাহিত্যকে মঙ্গল নামে চিহ্নিত করেছেন। এই বৈষ্ণব-কবিরা এই ধরণের নামকরণের মধ্যে বোধ হয় শুধু নামের মোহে ও সমাজে বহুল প্রচার পাবার আশাকে শিরোধার্য করেছেন। যেমন- চৈতন্য মঙ্গল, অদ্বৈত মঙ্গল প্রভৃতি। যদিও এই গ্রন্থগুলি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শ্রেণির। এগুলি বৈষ্ণব জীবন-চরিত সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত বর্তমানে আমরা যাকে মঙ্গলকাব্যের অভিধায় ভূষিত করি সেই মঙ্গলকাব্যরূপ কথাকাব্যের অন্তর্গত নয়।

বাংলা মঙ্গলকাব্যের উৎপত্তি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩১৪ বঙ্গাব্দে 'সাহিত্য' গ্রন্থের 'সাহিত্যসৃষ্টি' নামক প্রবন্ধে যে কথা বলেছেন, তা বিজ্ঞান সম্মত বললে অত্যুক্তি হবে না-

> ''দেশের সাধারণ লোকের মধ্যে প্রথমে কতকগুলি ভাব টুকরা টুকরা কাব্য হইয়া চারি দিকে ঝাঁক বাঁধিয়া বেড়ায়। তার পরে একজন কবি সেই টুকরা কাব্যগুলিকে একটা বড়ো কাব্যের সূত্রে এক করিয়া একটা বড়ো পিন্ড করিয়া তোলেন। হরপার্বতীর কত কথা যাহা কোনো পুরাণে নাই। রাম সীতার কত কাহিনী যাহা মূল রামায়ণে পাওয়া যায় না, গ্রামের গায়ক-কথকদের মুখে মুখে পল্লীর আঙিনায় ভাঙা ছন্দ ও গ্রাম্য ভাষার বাহনে কতকাল ধরিয়া ফিরিয়া বেড়াইয়াছে। এমন সময় কোনো রাজসভার কবি যখন, কুটিরের প্রাঙ্গণে নহে, কোনো বৃহৎ বিশিষ্ট সভায় গান গাহিবার জন্য আহুত হইয়াছেন, তখন সেই গ্রাম্য কথাগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া লইয়া মার্জিত ছন্দে গম্ভীর ভাষায় বড়ো করিয়া দাঁড় করাইয়া দিয়াছেন। পুরাতনকে নূতন করিয়া, বিচ্ছিন্নকে এক করিয়া দেখাইলেই সমস্ত দেশ আপনার হৃদয়কে যেন স্পষ্ট ও প্রশস্ত করিয়া দেখিয়া আনন্দ লাভ করে। ইহাতে সে আপনার জীবনের পথে আরও একটা পর্ব যেন অগ্রসর হইয়া যায়। মুকুন্দরামের চন্ডী, ঘনরামের ধর্মমঙ্গল, কেতকাদাস প্রভৃতি মনসার ভাসান, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল এইরূপ শ্রেণীর কাব্য; তাহা বাংলার ছোটো ছোটো পল্লী সাহিত্যকে বৃহৎ সাহিত্যে বাঁধিবার প্রয়াস। এমনি করিয়া একটা বড়ো জায়গায় আপনার প্রাণ পদার্থকে মিলাইয়া দিয়া পল্লী সাহিত্য, ফল-ধরা হইলেই ফুলের পাপড়ি গুলার মতো, ঝরিয়া পড়িয়া যায়।''[৯]

১৩০৫ সালে 'লোক সাহিত্যে'র অন্তর্গত 'গ্রাম্যসাহিত্যে' রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন-

> ''অন্নদামঙ্গল ও কবিকঙ্কণের কবি যদিচ রাজসভা ধনীসভার কবি, যদিচ তাঁহারা উভয়ে পন্ডিত, সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যে বিশারদ, তথাপি দেশীয় প্রচলিত সাহিত্যকে বেশি দূর ছাড়াইয়া যাইতে পারেন নাই। অন্নদামঙ্গল ও কুমারসম্ভবের আখ্যানে প্রভেদ অল্প; গ্রাম্য হরগৌরী। কবিকঙ্কণ চন্ডী, ধর্মমঙ্গল, মনসার ভাসান, সত্যপীরের কথা, সমস্তই গ্রাম্য কাহিনী অবলম্বনে রচিত। সেই গ্রাম্য ছড়াগুলির পরিচয় পাইলে তবেই ভারতচন্দ্র মুকুন্দরাম রচিত

> কাব্যের যথার্থ পরিচয় পাইবার পথ হয়। রাজসভার কাব্যে ছন্দ মিল ও কাব্যকলা সুসম্পূর্ণ সন্দেহ নাই, কিন্তু গ্রাম্য ছড়াগুলির সহিত তাহার মর্মগত প্রভেদ ছিল না।''[১০]

রবীন্দ্রনাথ একেবারে ছোটবেলা থেকে ছিলেন মঙ্গলকাব্যে উৎসাহী। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন-

> ''অপরপক্ষে বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণবপদকর্তা, কবিকঙ্কন, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, হরুঠাকুর, রাম বসু, নিধুবাবু, শ্রীধর কথক, প্রভৃতির প্রতি তাঁহার অনুরাগের সীমা ছিল না।''[১১]

মঙ্গলকাব্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পাই 'গ্রাম্য সাহিত্য' (লোকসাহিত্য-১৩০৫), 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (সাহিত্য-১৩০৯), 'বাতায়নিকের পত্র' ও 'শক্তিপূজা' (কালান্তর-১৩২৬) প্রভৃতি প্রবন্ধের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ দীনেশচন্দ্র সেনকে এক চিঠিতে লিখেছেন, ''বাংলা প্রাচীন সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি কাব্যগুলি ধনীদের ফরমাসে ও খরচে খনন করা পুষ্করিণী।''[১২] তাঁর মতে এই ধরণের কাব্যে আছে অকৃত্রিম রসসৃষ্টির অভাব। এক জায়গায় আক্ষেপের সুরে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-

> ''আজ পর্যন্ত আমাদের সাহিত্যে যদি কবিকঙ্কণ চন্ডী, ধর্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, মনসার ভাসানের পুনরাবৃত্তি নিয়ত চলতে থাকত তাহলে কী হত। পনেরো-আনা লোক সাহিত্য পড়া ছেড়েই দিত।''[১৩]

তিনি যে মঙ্গলকাব্যের পাতায় পাতায় মনোনিবেশ করেছেন তার প্রমাণ মেলে ১৩২৬ বঙ্গাব্দে লেখা চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা এক চিঠিতে-

> ''কবিকঙ্কণ এবং অন্নদামঙ্গল পড়ে নোট্ করে রেখেচি। এক কপি মনসামঙ্গল ও ধর্ম্মমঙ্গল যদি পাঠাতে পার তাহলে মঙ্গলকাব্য সম্বন্ধে আমার যা কিছু বক্তব্য আছে জানতে পারবে।''[১৪]

রবীন্দ্র-আহ্বানে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাড়া দিয়ে প্রায় সব মঙ্গলকাব্যের এক একখানি সংগ্রহ করে শান্তিনিকেতনে তাঁরই নির্দেশে রেখে আসেন। এরপর জানা যায় অল্পদিনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সেই বইগুলি ফেরত পাঠিয়ে দেন। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন-

> ''তিনিই (রবীন্দ্রনাথই) প্রথমে তাঁহার মন্তব্য দ্বারা আমার মনে সন্দেহ উদ্রেক করিয়া দেন যে কবিকঙ্কণ বৈষ্ণব ছিলেন। এই তথ্য আমি পরে আন্তর ও বাহ্য বহু প্রমাণ দ্বারা প্রমাণ করিতে সক্ষম হইয়াছি বোধ হয়।''[১৫]

৩ মঙ্গলকাব্যের সাধারণ আলোচনা

মঙ্গলকাব্যের সকল দেবতাই যে ভীষণ পরাক্রমশালী তা রবীন্দ্র আলোচনায় উঠে এসেছে-

> ''চন্ডী যেমন প্রচন্ড উপদ্রবে আপনার পূজা প্রতিষ্ঠা করেন মনসা-শীতলাও তেমনি তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। শৈব চাঁদ-সদাগরের দুরাবস্থা সকলেই জানেন। বিষহরি, দক্ষিণরায়, সত্যপীর প্রভৃতি আরও অনেক ছোটোখাটো দেবতা আপন আপন বিক্রম প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই।''[১৬]

তিনি মনে করেন মঙ্গলকাব্য গুলি হলো-

> ''এক দেবতাকে তার সিংহাসন থেকে খেদিয়ে দিয়ে আর-এক দেবতার অভ্যুদয়।''[১৭]

আসলে মঙ্গলকাব্য হলো দেব-মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক আখ্যান কাব্য। এ কাব্য মঙ্গল সূচক কাব্য। মঙ্গল শব্দের আভিধানিক অর্থ হল কল্যাণ। তাই বলা যায় যে কাব্য পাঠ করলে অথবা শ্রবণ করলে সকল প্রকার মঙ্গল সূচিত করে এবং কল্যাণ দান করে তা ই মঙ্গল কাব্য। এক দেবতার মাহাত্ম্য প্রচার ও পূজার প্রতিমা নিয়ে মনসামঙ্গল, চন্ডীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, শিবমঙ্গল, প্রভৃতি আখ্যানধর্মী কাব্য রচিত হয়। স্বর্গের দেব- দেবী অভিশাপ গ্রস্থ হয়ে মর্ত্যে ধুলিধূসরিত মানব গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁরা জন্ম নেন ধনী অথবা দীনহীন গরিবের ঘরে। বড় হন, বিয়ে করেন, সাংসারিক জীবনে আসে নানা উথাল-পাতাল, পড়েন নানা বিপদে, তারপর আরাধ্য দেব-দেবীর সহায়তায় বিপদের কবল থেকে মুক্তি পান, ধন-জন নিয়ে সুখে জীবন কাটিয়ে শেষে মৃত্যুর পর পাড়ি দেন স্বর্গ যাত্রায়। এই হলো মঙ্গলকাব্যের কাহিনি-কাঠামো।

এই ধরনের নামায়নের মধ্যে বিশেষ একটি তাৎপর্য বহন করে, বলা বাহুল্য তা ঐতিহাসিক ভাবে সত্যতা প্রমাণ করে। প্রাচীন যুগের বাংলার ভূ-খন্ড শাসিত হয়েছে হিন্দু শাসকদের দ্বারা। কিন্তু ১২০১ খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত সুদীর্ঘকালের ইতিহাস মূলত তুর্কি, পাঠান, মোগল সাম্রাজের উত্থান-পতনের সংঘাত ও সংঘর্ষের দ্বারা চিহ্নিত। এ সময় বাংলার বুকে নেমে আসে অবিরাম রাষ্ট্রনৈতিক দুর্যোগের ঘনঘটা। চলে শাসন ক্ষমতা লড়াইয়ের যুযুধান। শাসন ক্ষমতার দু-পক্ষই ছিল মুসলমান তথা ইসলাম ধর্মাবলম্বী, তাই সামাজিক ক্ষেত্রে হিন্দু-বৌদ্ধিকদের দ্বারা গঠিত পুরনো সমাজ কাঠামোতে আক্রমণের তীর এসে লাগতে থাকে অবিরত। এই আক্রমণ থেকে নিজেদের আত্মরক্ষার তাগিদে নেমে এলো পরিবর্তনের জোয়ার। এই পরিবর্তনকে গোপাল হালদার ব্যাখ্যা করেছেন এ ভাবে-

> ''কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বেই এ সব আখ্যান মিশে দানা বেঁধে উঠেছিল; সমাজের উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের পরস্পরের যোগাযোগের ফলে লৌকিক ও পৌরাণিক এই দুই ধারার মধ্যে

সংযোগ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। দুই বর্গের দেবদেবীর চরিত্র মিলে মিশে গিয়ে শিব, চন্ডী, প্রভৃতি এক-একটি মঙ্গল-কাব্যের দেবদেবীও মিশ্রিত রূপ লাভ করেছিল।''[১৮]

এই মন্তব্য থেকে আমরা পরিস্কার জেনে উঠতে পারি-

১) এর ফলে উচ্চ বর্গের হিন্দুরা নিম্ন বর্গীয় হিন্দুদের মধ্যে সংযোগ সেতু দৃঢ় হলো।

২) একের পর এক রাষ্ট্রিক বিপর্যয়ের ফলে পরাজিত হিন্দুরা তাদের সমাজ সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ করে তুলল।

৩) এমনকি আত্মরক্ষার তাগিদে তারা অনুভব করল 'সবে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ'।

৪) পরে মিলন ঘটল হিন্দু নিম্নবর্ণে-উচ্চবর্ণে।

৫) ফলে প্রথমে হিন্দু-মুসলমান সাধারণ মানুষের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হল। এরই

''ফলস্বরূপ বিজেতা মুসলমান ধীরে ধীরে হয়ে উঠলেন বাঙালী, রইলেন না আর বিদেশীয়।''[১৯] এবং

''তাই লৌকিক শিব চাষী, নেশাখোর, কুচুনি-পাড়ায় ঘুরে বেড়ান; পৌরাণিক দেবাদিদেব শিবের সঙ্গে তাঁকে মিশিয়ে আমরা নিয়েছি। কিন্তু অসামঞ্জস্য কোথাও কোথাও থেকে গিয়েছে বাঙালীর সম্মিলিত দেবতাদের মধ্যেও। অবশ্য এক্ষেত্রে পৌরাণিক শিবের আশ্চর্য মহৎ ধারণা ক্রমেই পরিব্যাপ্ত হয়ে লৌকিক চাষী-শিবের কাহিনীটিকে আজ কৌতুক ও কৌতুহলের বস্তু করে দিয়েছে। তেমনি লৌকিক চন্ডীও পৌরাণিক চন্ডীর সঙ্গে অভিন্ন হতে গিয়েও একাত্ম হয়ে যেতে পারেননি। সেক্ষেত্রেও দেখছি কালক্রমে পৌরাণিক চন্ডীরই প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ পৌরাণিক হিন্দু-কর্তাদের নেতৃত্বই ক্রমে সমাজে ও সাহিত্যে প্রবল হয়েছে - আপোস-রফার ফলে।''[২০]

'ভারত সংস্কৃতি' গ্রন্থে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন-

''অনার্য্যভাষীদের দ্বারা আর্য্যভাষা গৃহীত হবার সঙ্গে-সঙ্গে এদের ধর্ম্ম, দেবতা, আচার অনুষ্ঠানও আর্য্যীকৃত হয়ে গেল, সেগুলি সর্ব্বজন গৃহীত হ'য়ে প'ড়ল্- পৌরাণিক দেবতাবাদ, ভক্তিবাদ ইত্যাদি এল- বৈদিক ধর্ম্মের চেয়ে গভীরতর উন্নততর ধর্ম্মজীবন ভারতীয় সমাজে এল। অনার্য্যদের বড়ো বড়ো দেবতা- শিব, উমা, বিষ্ণু- অনুরূপ আর্য্যদের দেবতাদের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেলেন, তাঁদের আরও মহনীয় করে তুল্লেন। অনার্য্যদের বৃক্ষ দেবতা, যক্ষ,

> রক্ষঃ, নাগ, আর দৈবী শক্তির বিকাশ রূপে, দেবতারূপে কল্পিত নানা পশু পক্ষীর প্রতীকের মাধ্যমে পূজা- এ-সবও এসে গেল।''[২১]

এর থেকে বোঝা যায় বিদেশীয় এবং বিজাতীয়দের কবলে পড়ে তথাকথিত ব্রাহ্মণ্যবাদী উচ্চবর্গের শাসকেরা এতদিন নিম্নবর্গীয় ব্রাত্যদের যেভাবে অবহেলা ও ঘৃণার চোখে দেখত এমনকি আর্যেতর লৌকিক ধর্ম, দেব-দেবী প্রভৃতিকে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না, আজ তারা সবই মেনে নিলেন নিঃসংকোচে। ফলে নিম্নবর্গীয় ব্রাত্যের মনসা, চন্ডী, চাষা-ভূষা দেবতা শিব এবং কামকেলিযুক্ত প্রণয়-নায়ক কৃষ্ণ প্রভৃতি দেব-দেবীর মাহাত্ম্য সমাজের উচুতলায় স্বীকৃত ও গৃহীত হতে থাকল। এরই জন্য আশুতোষ ভট্টাচার্য জানালেন-

> ''মধ্যযুগের বাংলার সমাজ এই নূতন ও পুরাতনের মধ্যে সুন্দর সামঞ্জস্য বিধান করিয়া পরস্পর বিপরীতমুখী দুইটি সংস্কারকে একসূত্রে গাঁথিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে। বাংলার জলবায়ুতে দেশীয় লৌকিক সংস্কারের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য সংস্কার যে কিভাবে একদেহে লীন হইয়া আছে মঙ্গলকাব্যগুলি তাহারই পরিচয়।''[২২]

বিজেতা মুসলমানের ফলেই বাংলাদেশের মানুষ সংকীর্ণমনা বদ্ধজলাভূমি থেকে ক্রমশ বিস্তৃত সর্বজনীন দেশকালের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ ঘটল। তাই তথাকথিত চলে আসা হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্মের থেকে ইসলাম ধর্মের প্রগতিশীল চিন্তা-ভাবনায় অন্ত্যজ-অপাংক্তেয়-ব্রাত্য-নিম্নশ্রেণির মানুষেরা আকৃষ্ট হতে লাগল এই ধর্মের প্রতি। অরবিন্দ পোদ্দার সুন্দর ভাবে এর ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন-

> ''হিন্দু সামাজিক সংস্থার নির্মম বিধানে যারা নির্যাতিত হচ্ছিল-বর্ণ সমাজের অন্তর্গত নিম্নবর্গগুলি এবং বর্ণসমাজের বাইরের অস্পৃশ্য পর্যায়ের জাতিগুলি-তারা ঐস্লামিক সমাজ সংস্থায় আশ্রয় গ্রহণ করে সামাজিক নির্যাতন থেকে মুক্তিলাভ করেছে। হিন্দু সমাজের বিধানদাতাদের নিকট যারা ছিল শুদ্র এবং অস্পৃশ্য পর্যায়ের ইসলাম তাদের দিল মুক্ত মানুষের অধিকার, এবং তাই নয়, ব্রাহ্মণদের উপরেও প্রভুত্ব করার ক্ষমতা।....সামাজিক চিন্তাধারার এই উদারতা এবং সমানাধিকারের আর্দশই ভারতের সমাজেতিহাসে ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান।''[২৩]

তবুও কবিরা পুরাণকে সামনে রেখে উপরোক্ত পটভূমিকায় বাংলার মধ্যযুগের অন্যতম সাহিত্য মঙ্গলকাব্য গড়ে উঠেছে।

কোন কোন পন্ডিত মনে করেন যে বাংলা কাব্যের মনসা, চন্ডী ও শিবের কাহিনিতে লৌকিক ও পৌরাণিক উপাদানের সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। সম্প্রতি T. W. Clark বলেছেন-

৩ মঙ্গলকাব্যের সাধারণ আলোচনা

> "...There is a third phase, which is the work of thinkers, almost certainly Brahman teachers and apologists, who interpreted the popular materal as they found it, in terms of an orthodox metaphysic thereby making possible the inclusion of the stories in what may be called an orthodox Brahmanic literary canon. The potulation of this phase of activity is justified not only by the fact that without it the course of the evolution of certain religious myths cannot be accounted for, but by a further fact that terminological exponents of it are identifiable in the language of the poems themselves. " [২৪]

কিন্তু আর একটু বলা আবশ্যক বলে আমি মনে করি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'চার অধ্যায়' (১৯৩৪) উপন্যাসের মনোবিজ্ঞানী অধ্যাপক নরেশ দাশগুপ্তের কন্যা এলা রূপে-গুণে-বিদ্যায় অতুলনীয়া। তার পিতৃব্য ডাক বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। সুরেশের সুরমার পড়ার দায়িত্ব নিয়ে তাকে দিয়ে থিসিস লেখাতে চেয়েছে। 'বিষয়টা বাংলা মঙ্গলকাব্য ও চসারের কাব্যের তুলনা।' (ভূমিকা, চার অধ্যায়) দুটো সাহিত্যের-ই আলোচনায় রয়েছে মধ্যযুগ এবং দৈববাদ। প্রায় তমসাচ্ছন্ন তিমিরান্ধকার ইংল্যান্ডের মধ্যযুগের অবসানে রাষ্ট্রিক-সামাজিক, শিক্ষায়, সংস্কৃতি-চেতনায় নেমে এসেছিল এক বিরাট আলোড়ন। জিওফ্রে চসার (১৩৪০-১৪০০) ছিলেন এই নবজীবনের গীতিকার। আর আমাদের বাংলা সাহিত্যের মঙ্গলকাব্য গুলিও এর ব্যতিক্রম নয়। মঙ্গলকাব্যের প্রতিটি বিভাগে দেখা যায়, যেমন মনসামঙ্গলের মনসা, চন্ডীমঙ্গলের চন্ডীর যে ভয়ঙ্করী রূপ ও স্বরূপ তা ভারতচন্দ্রের হাতে এসে অনেকাংশে আরো বেশি হয়ে উঠেছে মানবিক। চসারের ক্যান্টারবারি টেলস্ (Canterbury Tales) এবং বাংলার মঙ্গলকাব্য গুলির লোকায়ত-ছবি সুচারুভাবে চিত্রিত। এখানে লুকিয়ে রয়েছে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য ও সম্পদ। চসারের কাব্য এবং বাংলা মঙ্গল কাব্যের মধ্যে যেমন রয়েছে হাস্যরস, তেমনি রয়েছে করুণ রসের জ্বলন্ত দিক। আবার চরিত্রের চিত্রশালায় দুই দেশের কাব্যের রয়েছে অতুলনীয় মিল। এদের আকৃতি-প্রকৃতিতেও রয়েছে অদ্ভুত মিল। এমনকি প্রকৃতির চিত্রশালায় চসার এবং মঙ্গলকাব্যের কবিরা সূক্ষ্ম পারদর্শিতায় অতুলনীয়। তবে কেন রবীন্দ্রনাথ এই দু'ধরনের কাব্যকেই প্রায় শেষ জীবনে বেছে নিলেন। এর কারণ খুঁজতে গেলে বলতেই হয়, যে রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে মঙ্গলকাব্যের নিয়মিত পাঠকই ছিলেন না, তিনি এর রসকে নিঙড়ে নিঙড়ে নিজ রসে জারিত করেছেন। এবং তিনি বোধ হয় লক্ষ্যও করেছেন এই বাংলা মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যই মহা মিলনের মহা মিলন তীর্থ। যার নির্মানরীতি পুরাণের হলেও, এবং যদিও পুরাণের পঞ্চ লক্ষণের (সর্গ, প্রতিসর্গ, দেববংশ, মন্বন্তরাদি এবং বংশানুচরিত) যথাযথ অনুসরণ সর্বাংশে লক্ষিত-রক্ষিত হয়নি কিন্তু এই কারণেই প্রারম্ভে রয়েছে দেবলীলাকীর্তন ও শাপভ্রষ্ট দেব-দেবীদের মানবরূপ পরিগ্রহের কথা। এরই

জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে অশুতোষ ভট্টাচার্যের সুবৃহৎ 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' পড়ে যে ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন তাতে রয়েছে রবীন্দ্র-মননের পরিশ্রমী মনের পরিচয়। তাই তিনি তো বললেন- মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে বাংলা কাব্য ভাষার প্রথম আত্মোপলব্ধির অভিব্যক্তি দেখা যায়।

মধ্যযুগের যে সব কাব্যশাখা বাংলা সাহিত্যের আসরে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল সেগুলির মধ্যে মঙ্গলকাব্যের বিশিষ্টতা সর্বাধিক। মঙ্গলকাব্যে বাংলাদেশের নিজস্ব দেব-দেবীর মাহাত্ম্য প্রকাশের চেষ্টা আছে। কাব্যগুলি মৌলিক আখ্যান কাব্য এবং সৃষ্টিপ্রাচুর্যে বহুশাখার বিস্তারে এদের গুরুত্ব অসাধারণ। মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবী অনার্য এবং আর্যভাবনার সহযোগে সৃষ্ট। তবে এদের ভিত্তিতে লোককল্পনা এবং সামাজিক প্রয়োজনবোধই বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। যেমন- মনসাদেবী বঙ্গদেশের জলাজঙ্গলাকীর্ণ দেশের অধিবাসীদের সর্পভয় হতে রক্ষা করেন, পুত্রহীনকে পুত্র দেন, এমনকি মুসলমান কাজী প্রভৃতি রাষ্ট্রিক অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই দেন। চন্ডীদেবী ব্যাধকে করেন রাজ্যদান, হারানো ছাগল অথবা স্বামীকে ফিরিয়ে দেন। ধর্মঠাকুর কুষ্ঠ শ্বেতী প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তি দেন, যুদ্ধে বিজয় দেন। ধনহীনকে করেন ধনদান। বাঘকুমারীর অত্যাচার থেকে আবাদীজমিকে মুক্ত করবার জন্য দক্ষিণ রায়ের পূজা করা হয়, বসন্ত রোগের উপশম ঘটে শীতলা পূজার দ্বারা- এই ধরনের আরো অনেক লোকসংস্কারজাত দেব-দেবী আর্য্য-ব্রাহ্মণ্য ভাবনায় জড়িয়ে মঙ্গলকাব্যে গৌরবের স্থান লাভ করেছে।

মঙ্গলকাব্য মৌলিক কাহিনি কাব্যের শাখা। অধিকাংশ মঙ্গলকবিই বস্তুনিষ্ঠ, কল্পনার ডানায় ভর করে বহুদূরে উড়ে যাবার প্রবণতা বা ক্ষমতা তাঁদের অনেকেরই ছিল না। তাঁরা জীবনের প্রত্যক্ষ ঘটনার বর্ণনা করেছেন। কাহিনির ফাঁকে ফাঁকে যেমন এনেছেন হাস্যরস, করুণ রস, তেমনি বীররসকেও তাঁরা কম গুরুত্ব দেননি। মধ্যযুগের বাংলাদেশে দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনামূলক বিশেষ একরকম সাম্প্রদায়িক সাহিত্য প্রচলিত ছিল। প্রত্যেক দেশেই ধর্মকে কেন্দ্র করে সাহিত্যের জন্ম হয়, বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম নয়। এই ধরনের কাব্যে প্রথম দিকে থাকে কুসংস্কার ও গোঁড়ামি। তাই-

> ''স্মৃতি-শাসিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের দুর্লঙ্ঘ্য বর্ণ-বিন্যাস, বৈদেশিক মুসলমান শাসনের পীড়ন এবং সামাজিক নানা বিশৃঙ্খলা ও বিপর্য্যয়ের মধ্যে দেশের জনসাধারণ নিজেদের ধর্ম্মবিশ্বাসকে উচ্চতর সমাজে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছে এবং এক সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজদের দেবতাকে অপর সম্প্রদায়ের দেব-দেবীর চেয়ে বড় করে দেখাতে যত্নবান হয়েছে। এই প্রতিযোগিতাপূর্ণ সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যমূলক সাহিত্য বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গলকাব্য নামে অভিহিত হয়।''[২৫]

৩ মঙ্গলকাব্যের সাধারণ আলোচনা

বৈশিষ্ট্য: মঙ্গলকাব্যগুলি দেব-দেবীকে উপলক্ষ্য করে রচিত হলেও তৎকালীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রিক, সামাজিক, পারিবারিক, অর্থনৈতিক জীবনের নিখুঁত ছবি ফুটে উঠেছে। তাই আমাদের জাতীয় লুপ্ত ইতিহাসের যে তথ্য এতে পাওয়া যায় তার মূল্য নিতান্ত কম নয়। কালক্রমে মঙ্গলকাব্য রচনার একটা প্রায় সু-নির্দিষ্ট প্রণালী দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সব মঙ্গলকাব্যের বিষয়বস্তু এবং রচনারীতি প্রায় একই ধরনের। সব মঙ্গলকাব্যের কবিরাই দেবতাদের স্বপ্নাদেশ পেয়ে তাঁদের মহিমা প্রচারে ব্রতী হয়ে নিজেদের লেখনী ধারণ করেছেন। সব নায়ক নায়িকাই শাপভ্রষ্ট অমর্ত্যলোকবাসী। নানা দুঃখ কষ্ট ভোগ করে সকলের দূর্গতি মোচন হয় দেব-দেবীর অনুগ্রহে। পূজা প্রচার শেষে তাঁরা ইহ জীবন ত্যাগ করে আবার দেবলোকে ফিরে যান। সেই সঙ্গে সৃষ্টিতত্ত্ব, বিশ্বকর্মা কর্তৃক পুরী নির্মান, হনুমান কর্তৃক বিক্রম প্রদর্শন ও মল্লযুদ্ধ শিক্ষাদান; ভীম কর্তৃক দুরূহ কাজ সম্পাদনা, নায়ক-নায়িকার অলংকার শাস্ত্রানুমোদিত রূপ বর্ণনা, কাঁচুলি নির্মান প্রসঙ্গ, কুল-কামিনীর পতিনিন্দা, বিরহিণীর বারমাস্যা, রন্ধন বিবরণ, দেবমহিমা সূচক চৌত্রিশা স্তব ইত্যাদি রচনা পদ্ধতি প্রায় এই রকম বৈচিত্র্যহীন। তবে যাই হোক মঙ্গলকাব্যের কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে যাকে আমরা সূত্রাকারে বলতে পারি এভাবে-

১) মঙ্গলকাব্যের শুরুতে থাকে দেবদেবীর বন্দনা। এর মধ্যে প্রথমে থাকে গণেশ বন্দনা। তারপর অন্যান্য দেব-দেবীর বন্দনা করে কাব্য আরম্ভ করা হয়। এই বন্দনা অংশে হিন্দু দেব-দেবীর পাশাপাশি শ্রীচৈতন্যদেবের বন্দনাও পাওয়া যায়। কোনো কোনো কবি ইসলামীয় দেবতাকে করেছেন বন্দনা। জাতিধর্মের বাঁধ ভেঙে মিলন-আকাঙ্খায় ব্যাপ্ত হয়েছে এই ধরনের কাব্যে। মুকুন্দের কাব্যে কিংবা ভারতচন্দ্রের কাব্যে এই ধরনের মিলনচেতা মনোভাব প্রকাশিত।

২) প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যে গ্রন্থোৎপত্তির কারণ বর্ণিত হয়।

৩) এই গ্রন্থোৎপত্তির বর্ণনায় উল্লেখ থাকে স্বপ্নাদেশ বা দৈবাদেশ।

৪) এই অংশে কবির ব্যক্তি জীবনের পরিচয় ফুটে উঠে।

৫) আবার এও ঠিক এই অংশ থেকেই তৎকালীন সমাজ মানসিকতার পরিচয়কে খুঁজে পান সকলে।

৬) প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যের কাহিনি দেবখন্ড ও নরখন্ড নামে দুটি পৃথক অংশে বিভক্ত। প্রথমাংশে দেবতার জন্ম পরিচয় এবং মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়। এই অংশে পৌরাণিক ও লৌকিকতার সমন্বয় সাধন চেষ্টায় রত থাকেন কবি স্বয়ং নিজে। বিশেষ করে দেব-দেবী যদি হন লৌকিক। আর দ্বিতীয়াংশে শাপভ্রষ্ট দেব-দেবী তাঁদের বিশেষ কোন ত্রুটির কারণে কখনো আবার বিনা কারনেই মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে মর্ত্যে মানুষরূপে জন্ম নিয়ে দেবদেবীর

পূজা প্রচার করেন। পূজাপ্রচারিত হয়ে যাওয়ার পর শাপভ্রষ্ট দেবদেবীরা আবার স্বর্গে যান ফিরে।

৭) মঙ্গলকাব্যে থাকে সংসার জীবনের রূঢ় বাস্তবতার ছবি। দেব-দেবী চরিত্র এবং মানব চরিত্র উভয়কে অবলম্বন করে প্রত্যেক কবি-বর্গ বাস্তবের ধুলিধূসরিত সংসার-জীবনের বর্ণনা দেন।

৮) বাঙালি তো রন্ধনরসিক-ভোজনপ্রিয় জাতি। মঙ্গলকাব্যের মধ্যে জাতীয় জীবনের এই চরিত্রকে বিশেষ করে বাঙালিকে খুঁজে পাওয়া যায় এই রন্ধন-তালিকা প্রণয়নের মাধ্যমে। শিব-পার্বতীর মধ্যে যে সব খাবারের কথা বলাবলি হয় তাতে বাঙালির খাদ্যরসিকতার সন্ধান খুঁজে নিতে অসুবিধা হয়না। বেথুয়া শাক, নিমে শিমে বেগুনে এসব খাবার তো বাঙালির বড়ই প্রিয়।

৯) নারীর পতিনিন্দা মনস্তত্ত্ব সম্মত বর্ণনা প্রায় প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যে বর্ণিতব্য।

১০) মধুর বসন্তকালেও স্বামী সঙ্গে এক শয্যা কোষেক অন্তর একথা মুকুন্দের 'অভয়া মঙ্গলে'র ফুল্লরা তার প্রতিদ্বন্দ্বিনী ছদ্মবেশিনী চন্ডীকে বীতশ্রদ্ধ করতে চেয়েছিল, কিন্তু কেবল এই কারনেই নয় অন্যান্য কারনেও মঙ্গলকাব্যের নায়িকাদের বারমাসী বা বারমাস্যার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে সুচারুভাবে।

১১) 'ক' থেকে 'হ' পর্যন্ত রয়েছে চৌত্রিশটা অক্ষর। এই চৌত্রিশটি বর্ণকে আদ্যক্ষর হিসেবে মঙ্গল-কবিরা তাঁদের মঙ্গলকাব্যে দেব-দেবীর যে স্তবগান করেছেন তাকেই বলে চৌতিশা স্তব। এই ধরনের স্তব সংযোজন মঙ্গলকাব্যের একটা বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে।

১২) মঙ্গলকাব্যের নায়ক-নায়িকাদের অনেকে বণিক বলে কাব্যে রয়েছে সমুদ্রযাত্রার বিবরণ। যেমন-চাঁদ সদাগর, শ্রীমন্ত সদাগর প্রমুখ।

১৩) প্রবাদ-প্রবচনের প্রহেলিকাময় ধাঁধায় উঠে এসেছে তৎকালীন সমাজ জীবনের বিচিত্র দিক।

১৪) সমাজের ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তিধারী মানুষের পরিচয় অনেক সময় দেওয়া হয়েছে নগরপত্তন প্রভৃতি অংশে।

১৫) বিবাহ, সাধভক্ষণ, অন্নপ্রাসন, দশবিধ সংস্কারের বর্ণনাও মেলে মঙ্গলকাব্যের পাতায় পাতায়।

১৬) বিশ্বকর্মার পুরী নির্মান বা কাঁচলী নির্মান প্রভৃতি অংশের অবতারণা রয়েছে মঙ্গলকাব্যে।

১৭) মঙ্গলকাব্যের অনেকাংশ জুড়ে রয়েছে অলৌকিকতার তথা অপ্রাকৃতের বাতাবরণ।

১৮) মঙ্গলকাব্যগুলিকে আশ্রয় করে পয়ার ছন্দের বিচিত্র রূপ যেমন দেখা দিয়েছিল, তেমনি ত্রিপদী ছন্দের ব্যবহারও ছিল প্রচুর পরিমানে। তাই বলা আবশ্যক যে বাংলা মঙ্গলকাব্যে রয়েছে ছন্দ পরীক্ষার জ্বলন্ত উদাহরণ।

১৯) মঙ্গলকাব্যের কবিদের মধ্যে ধ্রুবপদ যোগ করার কথা রয়েছে। এই ধ্রুবপদ থাকার মধ্যে রয়েছে মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, কারণ এটি যে একটি গেয় কাব্য।

৩ মঙ্গলকাব্যের সাধারণ আলোচনা

মঙ্গলকাব্যের বিভাজন ও কবিবর্গ: মঙ্গলকাব্য বাংলার মাটির সম্পদ। এখানে রয়েছে আদিম সরলতার মূল সুর। প্রতিটি মঙ্গলকাব্যের বাহ্য রূপটি পৌরাণিক। দেব-দেবীদের ইতিহাস, তাঁদের ঘর-সংসার, দ্বন্দ্ব এবং প্রাধান্য লাভের চেষ্টা, আবার অকারণে অভিশাপ দান ও মানুষের কাছে জোর পূর্বক সর্ব শক্তি নিয়োগ করে পূজা আদায়ের এক করুণ প্রহসন, এই ধরনের কাব্যের মূল বিষয়বস্তু। দেব-দেবীদের যে পরিচয় রয়েছে তা থেকে সহজে খুঁজে পাওয়া যায় উচ্চ কোটির দেবমহত্ত্ব মহীয়ান নয় বরং অতি তুচ্ছ সাধারণ মানুষের দুর্বলতাই তাঁদের চরিত্রে বিরাজমান। তাই ঈর্ষা, ভীতি, নিষ্ঠুরতা, কুটিলতা ও লোভের পরিচয়ই সর্বত্র। আসলে এঁরা নামে দেবতা হলেও প্রকৃতিতে সাধারণ মানুষ। মঙ্গলকাব্যের পাতায় পাতায় যে দ্বন্দ্বের পরিচয় রয়েছে তা একেবারে ধুলি ধূসরিত সাধারণ নর-নারীর দ্বন্দ্ব।

মঙ্গলকাব্যের উদ্ভাবন-কাল ত্রয়োদশ শতাব্দী। যদিও আমরা জানি সেই সময়কার কোন পুঁথি আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। মঙ্গলকাব্যের লিখিত পুঁথির সন্ধান মেলে পঞ্চদশ শতাব্দীতে। এই মঙ্গলকাব্যগুলিতে মূলত সাতটি দেব-দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

১) মনসামঙ্গল। ২) চন্ডীমঙ্গল। ৩) ধর্মমঙ্গল। ৪) শিবমঙ্গল বা শিবায়ন। ৫) দূর্গামঙ্গল। ৬) কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর কাব্য। ৭) অন্নদামঙ্গল। ৮) অন্যান্য মঙ্গলকাব্য- ক) বাসুলীমঙ্গল, খ) শীতলামঙ্গল, গ) ষষ্ঠীমঙ্গল, ঘ) সারদামঙ্গল, ঙ) রায়মঙ্গল এবং চ) সূর্যমঙ্গল প্রধান।

মনসামঙ্গলের কবি: দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' নামক গ্রন্থে মনসামঙ্গলের মোট ৬২ জন কবির নামোল্লেখ করেছেন। এঁরা হলেন ১) কানা হরিদত্ত, ২) নারায়ণ দেব, ৩) বিজয় গুপ্ত, ৪) রঘুনাথ, ৫) যদুনাথ পন্ডিত, ৬) বলরাম দাস, ৭) জগন্নাথ সেন, ৮) বংশীধর, ৯) দ্বিজ বংশী দাস, ১০) বল্লভ ঘোষ, ১১) বিপ্রহৃদয়, ১২) গোবিন্দ দাস, ১৩) গোপীচন্দ্র, ১৪) বিপ্র জানকীনাথ, ১৫) দ্বিজ বলরাম, ১৬) কেতকীদাস, ১৭) ক্ষেমানন্দ, ১৮) অনুপম চন্দ্র, ১৯) রাধাকৃষ্ণ, ২০) হরিদাস, ২১) কমলনয়ন, ২২) সীতাপতি, ২৩) রামনিধি, ২৪) কবি চন্দ্রপতি, ২৫) গোলোক চন্দ্র, ২৬) কবি কর্ণপূর, ২৭) জানকী নাথ, ২৮) বর্ধমান দাস, ২৯) ষষ্ঠীবর সেন, ৩০) গঙ্গাদাস সেন, ৩১) রাম বিনোদ, ৩২) আদিত্য দাস, ৩৩) কমললোচন, ৩৪) কৃষ্ণানন্দ, ৩৫) পন্ডিত গঙ্গাদাস, ৩৬) গুণানন্দ সেন, ৩৭) জগদ্বল্লভ, ৩৮) বিপ্র জগন্নাথ, ৩৯) জগমোহন মিত্র, ৪০) জয়দেব দাস, ৪১) দ্বিজ জয়রাম, ৪২) নন্দলাল, ৪৩) বাণেশ্বর, ৪৪) মধুসূদন দেব, ৪৫) বিপ্র রতিদেব, ৪৬) রতিদেব সেন, ৪৭) রামকান্ত, ৪৮) দ্বিজ রসিকচন্দ্র, ৪৯) রাজা রাজসিংহ, ৫০) রামচন্দ্র, ৫১) রামজীবন বিদ্যাভূষণ, ৫২) বিপ্র রামদাস, ৫৩) রামদাস সেন, ৫৪) দ্বিজ বনমালী, ৫৫) বনমালী দাস, ৫৬) বিপ্র দাস, ৫৭) বিশ্বেশ্বর, ৫৮) বিষ্ণুপাল, ৫৯) সুকবি দাস, ৬০) সুখ দাস, ৬১) সুদাম দাস, ৬২) দ্বিজ হরিরাম।[২৬]

কিন্তু সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকে উত্তরবঙ্গের অন্তত যে তিনজন কবির মনসামঙ্গলের কবির কথা জানতে পারি তাঁদের তো নামোল্লেখ করেননি দীনেশচন্দ্র সেন। এই তিনজন বিখ্যাত কবি হলেন- ১) তন্ত্র-বিভূতি, ২) জগৎজীবন ঘোষাল এবং ৩) জীবনকৃষ্ণ মৈত্র। এছাড়া মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেছেন-

> ''গত একশত বৎসরের মধ্যে আমরা কয়েকজন মনসামঙ্গল রচয়িতার নাম এখন উল্লেখ করিতেছি- জগমোহন মিত্র- তাঁহার মনসামঙ্গলের রচনাকাল ১২৫১ সাল (১৮৪৪ খ্রীঃ), দ্বিজ কালীপ্রসন্ন- যশোহর জিলার অন্তর্গত মল্লিকপুরে তাঁহার নিবাস ছিল। তাঁহার কাব্যের রচনাকাল ১২৬৭ সাল (১৮৬০ খ্রীঃ), বৈদ্যনাথ- নিবাস কুচবিহার অঞ্চলে। কবির অন্য কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। রাধানাথ রায়চৌধুরী- ইনি শ্রীহট্ট নিবাসী। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে তিনি তাঁহার মনসামঙ্গল রচনা করেন।''[২৭]

চন্ডীমঙ্গলের কবি: চৈতন্যদেবের পূর্ব থেকেই মনসা ও চন্ডীমঙ্গলের গীত ভীষণভাবে জনপ্রিয় ছিল। চন্ডীমঙ্গলের যে সমস্ত কবির নাম পাওয়া গিয়েছে, এখন তার তালিকা দেওয়া যাক আশুতোষ ভট্ট াচার্যের 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' গ্রন্থানুসরে- ১) মানিক দত্ত, ২) দ্বিজ মাধব, ৩) কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, ৪) দ্বিজ রামদেব, ৫) মুক্তারাম সেন, ৬) দ্বিজ হরিরাম, ৭) ভারতচন্দ্র রায়, ৮) জয়নারায়ণ সেন, ৯) ভবানীশঙ্কর দাস, ১০) অকিঞ্চন চক্রবর্তী।[২৮]

ধর্মমঙ্গলের কবি: মধ্যযুগের বাংলায় সাহিত্যে চন্ডী ও মনসার পূজার প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে ধর্মপূজার বিস্তৃতি লাভের সাথে সাথে অনেক কবিই ধর্মমঙ্গল রচনা করেন। আমরা তার একটা তালিকা এখানে দিতেছি- ১) আদি রূপরাম; ২) খেলারাম; ৩) মাণিকরাম; ৪) রূপরাম; ৫) শ্যামপন্ডিত; ৬) সীতারাম; ৭) রামদাস; ৮) প্রভুরাম, ৯) ঘনরাম; ১০) রামচন্দ্র; ১১) সহদেব; ১২) নরসিংহ; ১৩) হৃদয়রাম; ১৪) গোবিন্দরাম; ১৫) রামনারায়ণ; ১৬) রামকান্ত; ১৭) দ্বিজ ক্ষেত্রনাথ; ১৮) নিধিরাম গাঙ্গুলী; ১৯) শঙ্কর চক্রবর্তী।[২৯]

কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর কাব্যের কবি: ১) কঙ্ক; ২) দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ; ৩) সাবিরিদ খান; ৪) গোবিন্দ দাস; ৫) কৃষ্ণরাম; ৬) প্রাণরাম; ৭) বলরাম চক্রবর্তী কবিশেখর; ৮) রামপ্রসাদ সেন কবিরঞ্জন; ৯) ভারতচন্দ্র; ১০) নিধিরাম আচার্য কবিরত্ন; ১১) দ্বিজ রাধাকান্ত; ১২) কবীন্দ্র; ১৩) মদন দত্ত; ১৪) মধুসূদন; ১৫) ক্ষেমানন্দ; ১৬) বিশ্বেশ্বর; ১৭) কবিচন্দ্র।[৩০]

সত্যপীরের পাঁচালীর কবি: ১) ফয়যুল্লাহ্, ২) ভৈরবচন্দ্র ঘটক, ৩) ঘনরাম চক্রবর্তী, ৪) রামেশ্বর চক্রবর্তী, ৫) ফকিররাম দাস, ৬) বিকল চট্ট, ৭) দ্বিজ গিরিধর, ৮) মৌজিরাম ঘোষাল, ৯) কৃষ্ণকান্ত, ১০) শিবচরণ, ১১) রামশঙ্করণ সেন, ১২) কৃপারাম, ১৩) কাশীনাথ ভট্টাচার্য সার্বভৌম, ১৪) দ্বিজ

রামধন, ১৫) দ্বিজ নন্দরাম, ১৬) অযোধ্যারাম রায় কবিচন্দ্র, ১৭) দ্বিজ রাম ভদ্র, ১৮) দ্বিজ বিশ্বেশ্বর, ১৯) ভারতচন্দ্র রায়, ২০) জনার্দন, ২১) দ্বিজ নরহরি, ২২) দ্বিজ রামচন্দ্র ২৩) দুর্গাপ্রসাদ ঘটক, ২৪) ঈশান গোস্বামী, ২৫) নরহরি, ২৬) মধুসূদন, ২৭) দ্বিজ কালিদাস, ২৮) দ্বিজ বিশ্বনাথ, ২৯) গোবিন্দ ভাগবত, ৩০) শিবচন্দ্র সেন, ৩১) বিপ্রনাথ সেন, ৩২) দ্বিজ রামকিশোর, ৩৩) লালা জয়নারায়ণ সেন, ৩৪) দ্বিজ রামানন্দ, ৩৫) দ্বিজ রঘুনাথ, ৩৬) দ্বিজ রামকৃষ্ণ, ৩৭) ফকির চাঁদ, ৩৮) দ্বিজ দীনরাম, ৩৯) নয়নানন্দ, ৪০) দ্বিজ রঘুরাম, ৪১) দ্বিজ হরিদাস, ৪২) বিজয় ঠাকুর, ৪৩) শিবরাম রাজা, ৪৪) দেবকীনন্দন, ৪৫) গঙ্গারাম, ৪৬) শিবনারায়ণ, ৪৭) কুমুদানন্দ দত্ত, ৪৮) মুক্তরাম দাস, ৪৯) বিদ্যাপতি, ৫০) শ্রী কবিবল্লভ, ৫১) কিঙ্কর, ৫২) ফকির রাম, ৫৩) কৃষ্ণ বিহারী, ৫৪) আরিফ, ৫৫) দ্বিজ গুণনিধি, ৫৬) লালমোহন, ৫৭) দয়াল, ৫৮) শঙ্কর আচার্য, ৫৯) কৃষ্ণহরি দাস, ৬০) ফকিররাম কবিভূষণ, ৬১) শাহ গরীবুল্লাহ্, ৬২) জয়নাথ বিশি।[৩১]

অন্নদামঙ্গল কাব্যের কবি হলেন রায় গুণাকার ভারতচন্দ্র।

বাসুলীমঙ্গলের কবি হলেন ধুসদত্ত।

শীতলামঙ্গলের কবিগণের মধ্যে রয়েছেন ১) নিত্যানন্দ, ২) দৈবকীনন্দন কবিবল্লভ, ৩) কৃষ্ণনাথ, ৪) রামপ্রসাদ সেন, ৫) শঙ্করাচার্য, ৬) রঘুনাথ দত্ত, ৭)কৃষ্ণরাম, ৮) মাণিকরাম গাঙ্গুলী, ৯) দয়াল, ১০) অকিঞ্চন চক্রবর্তী, ১১) দ্বিজ গোপাল, ১২) গঙ্গারাম দত্ত, ১৩) জয়নাথ বিশি, ১৪) ঘনরাম।[৩২] শীতলামঙ্গল যথার্থভাবে মঙ্গলকাব্যের রীতিতে রচিত। এখানে মুকুন্দ চক্রবর্তীর চন্ডীমঙ্গলের ধনপতির আখ্যান অনুসৃত হয়েছে। কাব্যখানি আকারে যথেষ্ট ছোট হলেও এখানে তিনটি কাহিনি লক্ষ্য করা যায়। মদনদাস জগাতির কাহিনি, কাজির এবং হৃষীকেশ সাধুর কাহিনি রয়েছে।

ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্যের যে সমস্ত কবির পরিচয় মেলে তাঁদের মধ্যে প্রাচীনতম কবি হলেন কৃষ্ণরাম দাস। এই কবির কাব্য রচনাকাল হল ১৬০৭ শকাব্দ বা ১৬৮৫-১৬৮৬ খ্রিঃ। ষষ্ঠী পূজা উপলক্ষ্যে ষষ্ঠীমঙ্গল রচিত। ষষ্ঠীপূজা আসলে বাংলাদেশের বহু প্রচলিত ব্রতকথা। এই ব্রতকথা পূর্ববঙ্গের স্ত্রী সমাজে আজও প্রচলিত। এই ব্রতপালনে রয়েছে নানা বৈচিত্র্যের ডালি। যেমন অরণ্যষষ্ঠী, অনুষষ্ঠী, লুঠনষষ্ঠী ইত্যাদি। সন্তান জন্মের সঙ্গে সঙ্গে যে ষষ্ঠীদেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়, যিনি নবজাতকের রক্ষাকারিণী বলে আজও মায়েরা ষষ্ঠীমঙ্গলের ষষ্ঠীদেবীকে পূজা করেন। এ দেবী নারী সমাজের কাছে উপাস্য। এই কাব্যের অন্যান্য কবিরা হলেন রুদ্ররাম চক্রবর্তী বিদ্যাভূষণ, রামধন চক্রবর্তী, শঙ্কর এবং কবিচন্দ্র ও গুণরাজের ষষ্ঠীমঙ্গলের কোন পুঁথি পাওয়া যায়নি।

সারদামঙ্গল হলো দেবী সরস্বতীর মাহাত্ম্যসূচক কাব্য। এই কাব্যের একজন লেখক হলেন দয়ারাম দাস।

> ''অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে ময়মনসিংহ সুসঙ্গের সাহিত্যিক রাজা রাজসিংহ 'ভারতীমঙ্গল' নামে একখানি কাব্য লিখেন। ইহার বিষয়বস্তু হইল কিরূপে কালিদাস সরস্বতী কুন্ডে স্নান করিয়া সরস্বতীর বরে অপূর্ব কবিত্ব শক্তি লাভ করেন।''[৩৩]

রায়মঙ্গল কাব্যে বর্ণিত হয়েছে- দক্ষিণবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলের ব্যাঘ্রের অধিকারী দক্ষিণ রায়ের মাহাত্ম্য। চব্বিশ পরগনার নিমতা নিবাসী কৃষ্ণরামের রায়মঙ্গল কাব্যের রচনাকাল- ''বসু শূন্য ঋতু চন্দ্র শকের বৎসর।'' অর্থাৎ ১৬০৮ শক (১৭৮৬-৮৭ খ্রীঃ)[৩৪] হয়। কৃষ্ণরাম তার পূর্ববর্তী কবি হিসেবে মাধবাচার্যের নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাঁর কাব্য পাওয়া যায়নি। রায়মঙ্গলের আরো দু'জন কবি হলেন রুদ্রদেব এবং হরিদেব।

> ''উত্তরবঙ্গে এক ব্যাঘ্রদেবতা সোনা রায়ের মাহাত্ম্যসূচক গীত প্রচলিত আছে। মুসলমান কৃষকগণ তাঁহাকে পীর করিয়া ভক্তি করে।''[৩৫]

দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে ব্যাঘ্র দেবতা কালুরায় নামে পূজিত হয়। তার মাহাত্ম্যসূচক কাব্য কালুরায়ের গীত নামে পরিচিত। শীতলামঙ্গলের কবি দ্বিজ নিত্যানন্দ এবং শ্রীবল্লভের দু'খানি কালুরায়ের গীতের পরিচয় মেলে।

> ''মুন্শী বয়নুদ্দীন রচিত 'বনবিবির জহুরানামায়' দক্ষিণরায় এবং বনবিবির কেচ্ছা পাওয়া যায়। তাহাতে দক্ষিণরায়ের উপর বনবিবি এবং তাহার ভ্রাতা জঙ্গলীর মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।''[৩৬]

গঙ্গামঙ্গল: দেবী গঙ্গার মাহাত্ম্য এবং ভগীরথের মাধ্যমে মর্ত্যে গঙ্গাকে আনয়নের বৃত্তান্তানুসরণে যে কাব্য রচিত হয়েছিল, তা-ই প্রধানত গঙ্গামঙ্গল নামে পরিচিত। পুরাণাশ্রিত কাহিনি হলেও মঙ্গলকাব্যের আদলে গঙ্গামঙ্গল কাব্য রচিত হয়েছে।

> ''দেবলীলার অন্তরালে মানবজীবনরসের উৎসারেরও অবকাশ অল্প, তবুও এই কাব্য যে একদিন স্মার্ত হিন্দুর ধর্মপিপাসাকে মিটিয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই।'' [৩৭]

সূর্যমঙ্গল কাব্যে বর্ণিত হয়েছে সূর্যের মাহাত্ম্য। এটি আদিত্যমঙ্গল নামেও খ্যাত। এই কাব্যের কবিরা হলেন রামজীবন, দ্বিজ কালিদাস এবং এর অন্যতম লেখন দ্বিজ লক্ষণ।

৩ মঙ্গলকাব্যের সাধারণ আলোচনা

উপরে বর্ণিত মঙ্গল কাব্যেরও অতিরিক্ত বরদামঙ্গল, গোসানীমঙ্গল, লক্ষ্মীমঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল ও কপিলামঙ্গল কাব্যে বা পাঁচালীতে লৌকিক ও পৌরাণিক দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। হিন্দুদের দেখাদেখি মুসলমানেরা পীর মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য পুঁথি লিখেছেন। এগুলিকে 'পীরমঙ্গল' বলা হয়। যেমন বয়নুদ্দীন রচিত 'বনবিবির জহুরনামা', মুহম্মদ খাতেরের বনবিবির মাহাত্ম্য সম্বন্ধে একটি পুঁথি আছে। এতদ্ব্যতীত মানিক পীর, পীর গোরাচাঁদ, একদিল শাহ্, মোবারক গাজী এবং গাজী ও কালুর পুঁথি প্রচলিত ছিল ও আছে।[৩৮]

স্থানীয় ও পৌরাণিক দেব-দেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন করে কিছু কিছু ক্ষুদ্র পাঁচালী আকারের কাব্য বাঙালি ঘরে ভীষণভাবে প্রচলিত। এদের মধ্যে রয়েছে, দেবী লক্ষ্মীর মাহত্ম্য বর্ণিত কাব্য 'লক্ষ্মীমঙ্গল'। এছাড়া ভাগবতের কাহিনি অনুসারে ব্রহ্মাদেবের কপিলা ধেনু হরণের কাহিনি নিয়ে 'কপিলামঙ্গল', বরদেশ্বরীর মাহাত্ম্য কীর্তন করে 'বরদামঙ্গল' কামাখ্যা দেবীর মাহাত্ম্যানুসরণে 'কামাখ্যামঙ্গল' ইত্যাদি নামে কয়েকটি মঙ্গল কাব্য পাওয়া যায়।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

১। ভট্টাচার্য, আশুতোষ: বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, অষ্টম সংস্করণ, বইমেলা ১৯৯৮, পৃ.-১১

২। ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস: 'মনসামঙ্গল'- বিজনবিহারী ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), ভূমিকা অংশ, পৃ-০১

৩। ভট্টাচার্য, আশুতোষ: বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, অষ্টম সংস্করণ, বইমেলা ১৯৯৮, পৃ.-১৪

৪। তদেব, পৃ.-৬১

৫। তদেব, পৃ.-৬১

৬। হালদার, গোপাল: বাঙলা সাহিত্যের রূপ-রেখা, প্রথম খন্ড: প্রাচীন ও মধ্যযুগ, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৬, তৃতীয় মুদ্রণ, আষাঢ় ১৪০৭, পৃ. ১০৬

৭। তদেব, পৃ-১০৫

৮। তদেব, পৃ-১০৫

৯। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ: সাহিত্য সৃষ্টি, অষাঢ় ১৩১৪, সাহিত্য, রবীন্দ্র শতবার্ষিক সংস্করণ, ত্রয়োদশ খন্ড, পৃষ্ঠা ৭৮৬-৭৮৭

১০ণ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ: গ্রাম্য সাহিত্য, ১৩০৫ লোকসাহিত্য, রবীন্দ্র শতবার্ষিক সংস্করণ, ত্রয়োদশ খন্ড, পৃষ্ঠা ৭১৭

১১। অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্র শতবার্ষিক সংস্করণ, দশম খন্ড, পৃষ্ঠা ৬০

১২। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ: গ্রাম্য সাহিত্য, ১৩০৫ লোকসাহিত্য, রবীন্দ্র শতবার্ষিক সংস্করণ, ত্রয়োদশ খন্ড, পৃষ্ঠা ৭১৭

১৩ণ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ: সোনার কাঠি, জ্যৈষ্ঠ১৩২২, বিচিত্র প্রবন্ধ, রবীন্দ্র শতবার্ষিক সংস্করণ, চতুর্দশ খন্ড, পৃষ্ঠা ৭৬৬

১৪। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ: চিঠিপত্র, চতুর্দশ খন্ড, ২২শে শ্রাবণ ১৪০৭ সংস্করণ, পত্রসংখ্যা-৭৭, পৃষ্ঠা ৯২

১৫। কবিকঙ্কণ চন্ডী, চন্ডীমঙ্গল বোধিনী, প্রথম ভাগ, কৃতজ্ঞতা স্বীকার : চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯২৫, প্রথম সংস্করণ

১৬। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ: বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, শ্রাবণ ১৩০৯, সাহিত্য, রবীন্দ্র শতবার্ষিক সংস্করণ, ত্রয়োদশ খন্ড, পৃষ্ঠা ৮১৪

১৭। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ: বাতায়নিকের পত্র, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, আষাঢ় ১৩২৬, কালান্তর, রবীন্দ্র শতবার্ষিক সংস্করণ, ত্রয়োদশ খন্ড, পৃষ্ঠা ২৮৩

১৮। হালদার, গোপাল: বাঙলা সাহিত্যের রূপ-রেখা,প্রথম খন্ড: প্রাচীন ও মধ্যযুগ, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৬, তৃতীয় মুদ্রণ, আষাঢ় ১৪০৭, পৃ. ১০৫

১৯। মন্ডল, ড. ইন্দুভূষণ: বাংলা মঙ্গলকাব্যে লৌকিক উপাদান- সাহিত্যলোক, কলকাতা ৬, আশ্বিন ১৪০৬, পৃষ্ঠা-১৫

২০। হালদার, গোপাল: বাঙলা সাহিত্যের রূপ-রেখা- প্রথম খন্ড: প্রাচীন ও মধ্যযুগ, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৬, তৃতীয় মুদ্রণ, আষাঢ় ১৪০৭, পৃ. ১০৬

২১। চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার: ভারত সংস্কৃতি, মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স প্রাঃ লিঃ কলকাতা-৭৩, পৃষ্ঠা- ১২

২২। ভট্টাচার্য, আশুতোষ: বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, অষ্টম সংস্করণ, বইমেলা ১৯৯৮, পৃ.-১৪

২৩। পোদ্দার, অরবিন্দ: মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা- ০৯, পঞ্চম মুদ্রণ, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ৪২-৪৩

২৪। T. W. Clark, Evolution of Hinduism in Medieval Bengali Literature: Siva, Candi, Manasa`, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, XVII (1953), No. 3 ; P. 504

২৫। বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসীপ্রসাদ: মধ্যযুগের বাঙ্গলা সাহিত্য, ডক্টর শ্রীযুত সুধীরকুমার দাশগুপ্ত (পরিচায়িত), দাশগুপ্ত এন্ড কোম্পানি লিমিটেড, কলিকাতা ১২, প্রথম সংস্করণ, আষাঢ় ১৩৫৮, পৃষ্ঠা ৪৯

২৬। সেন, দীনেশচন্দ্র: বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা ১৩, তৃতীয় মুদ্রণ : আগষ্ট ২০০২/বি, পৃষ্ঠা, ৪৬৪

২৭। শহীদুল্লাহ্, ডক্টর মুহম্মদ: বাংলা সাহিত্যের কথা দ্বিতীয় খন্ড- মধ্যযুগ- মাওলা ব্রাদার্স।। ঢাকা ১১০০, তৃতীয় মুদ্রণ নভেম্বর ২০০৭, পৃষ্ঠা-১৪১-১৪২

২৮। ভট্টাচার্য, আশুতোষ: বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, অষ্টম সংস্করণ, বইমেলা ১৯৯৮, পৃ.-৩৬৫-৪৬৯

২৯। শহীদুল্লাহ্, ডক্টর মুহম্মদ: বাংলা সাহিত্যের কথা দ্বিতীয় খন্ড- মধ্যযুগ- মাওলা ব্রাদার্স।। ঢাকা ১১০০, তৃতীয় মুদ্রণ নভেম্বর ২০০৭, পৃষ্ঠা- ১৫২

৩০। তদেব, পৃষ্ঠা- ১৬৩

৩১। তদেব, পৃষ্ঠা- ১৭৮

৩২। তদেব, পৃষ্ঠা- ১৮৪

৩৩। তদেব, পৃষ্ঠা- ১৮৫

৩৪। তদেব, পৃষ্ঠা- ১৮৫

৩৫। তদেব, পৃষ্ঠা- ১৮৬

৩৬। ভট্টাচার্য, আশুতোষ: বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, অষ্টম সংস্করণ, বইমেলা ১৯৯৮, পৃ.- ৭৩১-৭৩২

৩৭। পট্টনায়ক, ড. পুলক রঞ্জন: নারীচেতনার আলোকে মঙ্গলকাব্যের নারী, সাহিত্যশ্রী, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ-২০১০, পৃ-২১৬

৩৮। শহীদুল্লাহ্, ডক্টর মুহম্মদ: বাংলা সাহিত্যের কথা দ্বিতীয় খন্ড- মধ্যযুগ- মাওলা ব্রাদার্স।। ঢাকা ১১০০, তৃতীয় মুদ্রণ নভেম্বর ২০০৭, পৃষ্ঠা- ১৮৬